ইয়ারমূকের লড়াই



আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ আমাদের নবী ও শিক্ষক করে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষকে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে বসবাস করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। জ্ঞান, সাহস ও বীরত্ব ছাড়া সমাজে ভালভাবে বেঁচে থাকা যায় না। এজন্য প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানে লড়তে হয়। নবীজি আল্লাহ তা'আলার এ শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা হন। তৎকালীন পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ করে যাচ্ছিল। বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান ও ইসরাঈল নিয়ে সিরিয়া নামে রোমের একটি প্রদেশ ছিল। জর্ডান এলাকার ইয়ারমূক নদীর প্রান্তরে মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন অলীদের নেতৃত্বে রোমান বাহিনীর সাথে যে যুদ্ধ হয় তা-ই ইয়ারমূক যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনী থেকে সংখ্যায় কয়েক গুণ কম হয়েও বিজয় লাভ করে।

এ যুদ্ধে অংশগ্রণকারী মুসলিম বীরদের গৌরবগাঁথা আর তাদের উন্নত চরিত্রের কথা ছোটমনিদের জন্য সুন্দর করে তুলে ধরেছেন বিশিষ্ট লেখক আবূ সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই।

মুসলিমদের সোনালী যুগের এসব বীরত্বের কাহিনী পড়ে আমাদের ছোটমনিরা সুন্দর ও সাহসী হয়ে বেড়ে উঠবে এই প্রত্যাশায় বইটি ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশন শিশু-কিশোরদের জন্য এ ধরনের আরও অনেক বই প্রকাশ করে যাচ্ছে।

শিশু-কিশোরদের জন্য আরো সুন্দর সুন্দর বই প্রকাশ করার তওফিক লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের মুনাজাত!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ঊষা আশা নিশা শিফা শামীম ফারহানা,
কচি-কাঁচা তোমরা যারা জানা অজানা,
'ইয়ারমূকের লড়াই' খানি কচি জীবন-প্রাতে,
সোহাগভরে তুলে দিলাম তোমাদেরই হাতে।
ইয়ারমূকে ছিলেন যত শহীদ গাজী বীর,
তাঁদের মত হও তোমরা সমুন্নত শির।

লেখক

নবীজি বলেন ঃ

'ছোটদের প্রতি যারা স্নেহশীল নয়, বড়োদেরকে যারা সম্মান করে না, ভালো কাজের যারা নির্দেশ দেয় না এবং মন্দ কর্ম যারা নিষেধ করে না তারা আমার উম্মত নয়।'

বর্ণনা ঃ ইব্‌ন আব্বাস

শুরুর কথা

অনেক অনেক দিন আগের কথা। আমাদের নবীজি ইন্তিকাল করেছেন, তা'ও বছর দুই হয়ে এলো। তিনি না থাকলে কি হবে ? তাঁর প্রচারিত সত্য ধর্ম ইসলাম তো আছেই। দীন-ইসলাম প্রচারের জন্যে নবীজি কত কষ্টই না করেছেন!

নবীজির শিশুকাল থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কার ছোট-বড় সবাই তাঁকে ভালবাসতো। নবীজির নাম ছিল মুহাম্মদ। তবে মক্কার লোকেরা নবীজিকে মুহাম্মদ বলে ডাকতো না, ডাকতো আল-আমীন বলে।

আল-আমীন কেন বলতো জান ? আল-আমীন মানে বিশ্বাসী। মক্কার লোকেরা কেউ কোনদিন নবীজিকে মিথ্যা কথা বলতে শোনেনি। কাউকে ঠকাতে দেখেনি। আমানত খিয়ানত করতে দেখেনি। এজন্যে নবীজিকে তারা আল-আমীন বলে ডাকতো।

নবীজি কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করতেন না। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশতেন না। ছেলেবেলা থেকেই দুঃখীর দুঃখে কাতর হতেন। পাড়া-পড়শীর এটা-ওটা করে দিতেন। মাঠে বকরী চরাতেন। আর মাঝে মাঝে কি যেন ভাবতেন।

নবীজির প্রতি আল্লাহ্‌র পহেলা কথা

দিন যেতে লাগলো। নবীজির ভাবনাও বাড়তে লাগলো। তিনি আল্লাহ্‌র কথা ভাবেন। মক্কার মানুষের কথা ভাবেন। তারা কত খারাপ ! তারা ডাকাতি করে। মদ খায়। নিজেরা মারামারি করে। এ সব নবীজির ভাল লাগে না। মক্কার লোকদেরে তিনি ভাল মানুষ বানাতে চান। তাই রাতদিন শুধু এদের জন্যেই ভাবেন আর ভাবেন।

এভাবে দিন যায়। নবীজির বয়স এখন চল্লিশ বছর। আল্লাহ্ তাঁকে নবী বানাতে চাইলেন। একদিন জিবরাইল ফেরেশতা এসে নবীজিকে বললেন, হে মুহাম্মদ ! পড়। নবীজির প্রতি আল্লাহ্‌র পহেলা কথাই হলো 'পড়'। সে দিনই আল্লাহ্ তাঁকে নবী বানালেন।

নবীর কাজ

নবীর কাজ কি জান ? নবী মানুষকে আল্লাহ্‌র কথা বলেন। সবার সাথে সত্য কথা বলতে বলেন। মানুষকে ভালবাসতে বলেন। দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে বলেন। আরো কত ভাল ভাল কথা মানুষকে বলেন।

জিবরাইল ফেরেশতা মাঝে মাঝে এসে নবীজিকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিয়ে যান। নবীজি সাথে সাথে সে বাণী মুখস্থ করে নেন। তারপর মহল্লার লোকদের কাছে গিয়ে বলেন—আল্লাহ্ এক। আমি তাঁর রাসূল। মারা যাবার পর সব মানুষ নিজ নিজ কাজের হিসাব দেবার জন্যে একদিন জীবিত হবে। হে আমার প্রিয় দেশবাসী, তোমরা আমার এ কথা শোন এবং এতে ঈমান আনো।

এ সব কথা শুনে তো মক্কার লোকেরা হা হা করে হাসতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো—এর আগে তো আমরা এমন আজগুবি কথা আর শুনি নাই। লোকটা পাগল নাকি ?

প্রথমে তারা মনে করলো, তাঁকে জ্বিনে পেয়েছে। তাই তারা নবীজির কথায় কান দিল না। শেষে দেখা গেলো — না, মুহাম্মদ তো এখন দেবদেবীর বিরুদ্ধেও কথা বলতে শুরু করেছে। তখন মক্কাবাসীরা নবীজির উপর খুব রেগে গেলো। শুরু হলো নবীজির উপর তাদের জুলুম। এ জুলুম ছিল সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার জুলুম। কারণ, দীন-ইসলাম সত্য, আর দেব-দেবীর পূজা মিথ্যা। মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা করে নিজেরা উল্টো রাগ করলো নবীজির উপর। তারা নবীজিকে এক আল্লাহ্‌র কথা প্রচার করতে দিতে রাযী নয়। ইসলামের কথা প্রচার করতে দিতে রাযী নয়। ভাল ভাল কথা প্রচার করতে দিতে রাযী নয়। কারণ, তারা ছিলো দুষ্ট লোক। নবীজিকে প্রাণে মারার জন্যে তারা সবাই মিলে দল বাঁধলো। বাধ্য হয়ে নবীজি বাপ-দাদার দেশ ছেড়ে এক অচিন দেশের উদ্দেশে পথ ধরলেন।

নবীজি ঠাঁই নিলেন মদীনায়

পথে যেতে যেতে মনে পড়ে বহু কথা। নবীজির চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেক চেনা মুখ। শিশুকালে সবাই তাঁকে আদর করতো। এ মক্কাবাসীরাই তাঁকে আল্-আমীন বলে ডাকতো। তখন মক্কার কেউ তাঁর গায়ে হাত উঠাবার চিন্তাও করতো না। আবদুল্লাহর এতীম ছেলেকে কে না ভালবাসতো ? আর

আজ! আজ আর সে দিন নেই। এখন মক্কার অনেক লোকই তাঁকে কতল করতে চায়। আর তিনি চান, মক্কার সব মানুষ যেন দেব-দেবীর পূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। একে অপরকে ভালবাসে। বিপদে পাড়া-পড়শীর সাহায্য করে। বেদনাভরা হৃদয়ে বারবার মনে উদয় হতে লাগলো—হায়, 'জন্মভূমি' ! হায়, 'প্রিয় মক্কা' ! কেবল সত্য প্রচারের জন্যেই দেশবাসী আমাকে তোমার বুকে থাকতে দিলো না !

এভাবে পথ চলতে চলতে নবীজি ঠাঁই নিলেন মদীনায় গিয়ে। মদীনার লোকেরা ভাল ছিলো। নবীজিকে পেয়ে তারা খুব খুশী হলো।

নবীজি ভাবলেন, এবার শান্তিতে আল্লাহ্‌র কথা বলতে পারবো। বিনা বাধায় ইসলামের প্রচার চালিয়ে যেতে পারবো। কিন্তু মক্কার কাফেররা তা হতে দেয়নি।

এবার তারা মদীনায় গিয়েও দীন-ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাইলো। এবার কিন্তু নবীজি দুর্বল নন। তাঁর সাথে রয়েছেন তিনশ'রও বেশী সাহাবী। কেউ আনসার, কেউ মুহাজির। তারা সবাই নবীজির জন্যে জান দিতে তৈয়ার।

খতম হলো আবূ জাহল

মক্কার কাফের সরদার আবূ সুফিয়ান, আবূ জাহল, উত্‌বা, শায়বা মিলে এক হাজারেরও বেশী সৈন্য নিয়ে মদীনার কাছে বদর নামক স্থানে হাযির হলো। তাদের ইচ্ছে দীন-ইসলামকে চিরতরে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেবে।

মুসলমানরা তো আর ঘরে বসে দুশমনের আঘাতে মরতে পারে না ? তাই তাঁরাও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে বদরের ময়দানে হাযির হলেন। শুরু হলো লড়াই। এ লড়াইয়ে কাফেররা পরাজিত হলো দারুণভাবে। আবূ জাহল খতম হলো, উত্‌বা খতম হলো, খতম হলো শায়বা। একে একে সত্তর জন কাফের খতম হলো। আর সত্তরটি কাফের লড়াইয়ের মাঠে মুসলমানের হাতে বন্দী হলো। কাফেররা তাদের সঙ্গী-সাথীর সত্তরটি লাশ ফেলে মক্কায় ফিরে গেলো। এরপর তারা এর বদলা নেবার জন্যে বহুবার লড়াই করেছে। কাফেরদের সাথে মুসলমানদের অনেক বড় বড় লড়াই হয়েছে।

আজ তোমাদের কাছে এমনই একটি খুব বড় লড়াইয়ের কথা বলবো। দুশমনের সাথে এত বড় লড়াই কোন দিন হয়নি।

আমাদের নবীজি আর এ জগতে নেই। হযরত আবূ বকর (রা) মদীনায় খলীফা। মক্কা-মদীনার আশেপাশের রাজ্যের কাফের খ্রিস্টান ও ইহুদীরা মিলে মুসলমানদের খতম করার জন্যে ফন্দি আঁটলো। তারা লড়াই করে মুসলমানদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইলো।

মুসলমানরাও বীরের জাত। এক আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে তাঁরা ভয় করে না। কাফের ও খ্রিস্টানরা মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে চাইলো। মুসলমানরা বললো, ঠিক আছে; রাখ। তোমাদেরে লড়াইর মজা দেখাই। তখন তাদের সাথে অনেক লড়াই হলো। সব লড়াইয়ে মুসলমানরা জয়ী হলো। মুসলমানদের মধ্যে ক'জন বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁদের নাম শুনলেই দুশমনরা ভয়ে কাঁপতো। জান তাঁদের নাম?

তাঁরা হলেন হযরত খালিদ, হযরত ইকরামা, হযরত আমর বিন আস, হযরত আবূ উবায়দা ও হযরত মাআজ বিন জাবাল। হযরত খালিদ জীবনে কোন লড়াইয়ে পরাজিত হননি। যে লড়াইয়ে তিনি যেতেন সে লড়াইয়েই মুসলমানরা জয়ী হতো।

জর্ডান নদীর তীরে

মুসলমানদের বিজয় দেখে রূমের খ্রিস্টান সম্রাট খুব রেগে গেলো। মুসলমানদের সাথে লড়বার জন্যে তার সৈন্যদের জর্ডান নদীর তীরে ইয়ারমূকের ময়দানে জমায়েত করলো। তার ইচ্ছে হলো মুসলমানদেরে আচ্ছা করে শিক্ষা দেবে।

হযরত আবূ বকরও মদীনা থেকে সেপাই পাঠালেন ইয়ারমূকে। মুসলমান সেপাই মাত্র চল্লিশ হাজার। আর খ্রিস্টান সেপাই দু'লাখ চল্লিশ হাজারেরও বেশী।

বুঝতেই পারছ তারা সংখ্যায় কত বেশী ছিলো। কিন্তু মুসলমানেরাও বীরের জাত। তারা তাদের ভয় পাবে কেন? তাঁরা আল্লাহ্র দল, আর দুশমনরা শয়তানের দল। সোজা কথা শয়তানের দলের সাথে লড়াই হলে আল্লাহ্র দলই জয়ী হবে।

তোমরা হয়তো শুনেছো, হযরত খালিদ ছিলেন মহাবীর। তিনি প্রথমে এ লড়াইয়ে ছিলেন না। ইয়ারমূকের কাছেই অন্য এক রাজ্যে তিনি তখন লড়াই করছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) ভাবলেন—খালিদের মত বীর সেনাপতি ইয়ারমূকের লড়াইয়ে থাকার দরকার আছে। তাই তিনি খালিদকে তলব করে চিঠি পাঠালেন।

খলীফা আবূ বকরের চিঠি পেয়ে খালিদ ইয়ারমূকে গিয়ে হাযির হলেন। তিনি মুসলমান সেপাইদের বললেন, খলীফা আমাকে ডেকে এনেছেন তোমাদের সঙ্গে মিলে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু আমি দেখছি, তোমাদের মধ্যে একতার অভাব রয়েছে। দুশমনের সাথে লড়াই করার জন্যে এ অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এক হয়ে লড়াই করলে সহজেই আমরা জয়ী হবো। তোমরা

আমার কথা মেনে চল। তাহলে লড়াইতে আল্লাহ্‌র রহমতে দুশমনদের আমরা পরাজিত করতে পারবো। আল্লাহ্‌র সাহায্য পেলে তাদের এমন শিক্ষাই দেব যে, তারা আমাদের সাথে আর কখনো লড়তে সাহস পাবে না।

মুসলমান সেপাইরা হযরত খালিদকে সেনাপতি মেনে নিলো।

হযরত খালিদের বক্তৃতা

খালিদ ছিলেন খুব কুশলী সেনাপতি। তিনি মুসলমান ফৌজের সামনে জ্বালাময়ী ভাষায় এক বক্তৃতা দিলেন।

বক্তৃতায় হযরত খালিদ বললেন, "আজকের দিন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের দিন। আজ কেউ যেন নিজের শক্তির অহংকার না করে। আল্লাহ্‌র সাহায্যেই আজ আমরা দুশমনদের উপর জয়ী হবো। মনে রেখো, আজ আমরা যদি দুশমনদের পরাজিত করতে পারি, তারা আর কখনো আমাদের সাথে লড়তে সাহস পাবে না। তোমরা মনে করো না যে শত্রুরা সংখ্যায় বেশী, আর আমরা কম। তারা বেশী হলে কি হবে ? আল্লাহ্ যে আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ্ যাদের সাহায্য করেন, তারা কখনই কম নয়।"

বক্তৃতার পর হযরত খালিদ আল্লাহ্‌র নিকট মোনাজাত করে বললেন—ওগো আল্লাহ্ ! আজ মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের লড়াই। তুমি জান আমাদের মনের কথা। আমরা চাই তোমার বাণী মানুষের দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিত। আমরা না থাকলে কে তোমার নাম নেবে? ওগো আল্লাহ্! আমরা তোমারই বান্দা। তোমার বান্দাদের তুমিই সাহায্য করো।

মোনাজাতের পর হযরত খালিদ রূমী সৈন্যদের বললেন, তোমরা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাও। আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করবো না। তারা বললো, আমরা মরবো তবুও মুসলমান হব না। আমাদের সাথে লড়াইয়ে কেউ জয়ী হতে পারেনি। তোমরাও জয়ী হতে পারবে না।

শুরু হলো লড়াই

অতঃপর রূমী সেনাপতি মাহানের হুকুমে তার সৈন্যরা হাজার হাজার হাতী-ঘোড়া নিয়ে মুসলিম সেপাইদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুরু হলো তুমুল লড়াই।

হযরত খালিদও মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদলের উপর। শত্রুদের সামনের সারির তিরিশ হাজার সৈন্য লম্বা শিকলে নিজেদের পা এক সাথে বেঁধেছিলো।

কেন বেঁধেছিলো জানো ? এ জন্যে বেঁধেছিলো যে, কেউ যেন কাউকে ছেড়ে পালিয়ে না যেতে পারে।

হযরত খালিদ শিকলে বাঁধা রূমী সৈন্যদের কচু-কাটা করতে লাগলেন। রূমী সৈন্যদের লাশ মাটিতে পড়ে বিরাট এক স্তূপ হয়ে গেল। হযরত খালিদের ভয়ে হাজার হাজার রূমী সৈন্য লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। রাত হলো। দু-পক্ষই তখন যার যার শিবিরে চলে গেলো।

পরদিন ভোরে আবার লড়াই শুরু হলো। রূমী সৈন্যরা মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলমানরাও তীর, ধনুক, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে প্রাণপণ লড়াই করতে লাগলো। লড়তে লড়তে মুসলমানরা অগুণ্তি শত্রু-সৈন্য খতম করলো। রাত হলো। আবার লড়াই থামলো।

হযরত খালিদ, হযরত আবূ ওবায়দা ও হযরত ইকরামা সারা রাত আহত সৈন্যদের সেবা করতে লাগলেন। মুসলিম মহিলারা সৈন্যদের পানি পান করাতেন। আহত সৈন্যদের ব্যান্ডেজ করে দিতেন। আর বীরত্ব গাথা পাঠ করে সৈন্যদের মনে সাহস যোগাতেন। বহু নারী তলোয়ার হাতে শত্রুর মোকাবিলা করতেন। তোমরা বড় হলে বীরাঙ্গনা হিন্দা ও খাওলার লড়াই'র কাহিনী ইতিহাস পড়ে জানতে পারবে।

লড়াইর জন্য উৎসাহিত করতে

হযরত মিকদাদ সৈন্যদের শিবিরে শিবিরে গিয়ে সুমধুর কণ্ঠে সূরা আন্‌ফাল পাঠ করে শোনাতেন।

সূরা আন্‌ফাল কেন পাঠ করতেন জানো ? সূরা আন্‌ফালে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে লড়াই'র জন্যে উৎসাহিত করেছেন। শত্রুর উপর বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। কী সুন্দরই না সূরা আন্‌ফালের বাণী !

তোমাদের নিশ্চয়ই সে বাণী শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে! তাই না ? তাহ'লে সংক্ষেপে শোন ঃ

আল্লাহ্ বলেন—হে নবী, লড়াই'র জন্যে মু'মিনদের উৎসাহিত করুন। দুশমনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে শক্তি ও ঘোড়া তৈরী করুন। এক'শ জন ধৈর্যশীল মু'মিন এক হাজার কাফেরের উপর জয়ী হবে। তবে সাবধান! লড়াই'র মাঠে তোমরা অটল থাকবে। শত্রুর ভয়ে লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। যারা পালিয়ে যাবে, তারা কোনদিন আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবে না। আর লড়াই'র মাঠে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র [illegible] তা'হলে আল্লাহ্ তোমাদের জয়ী

করবেন। মুসলমানদের সাহস বাড়াবার জন্যে আরো কত সুন্দর কথা রয়েছে সূরা আন্‌ফালে।

ভেঙ্গে গেল নয়টি তলোয়ার

পরদিন খুব ভোরে আবার লড়াই শুরু হলো। মুসলমান সৈন্যরা শত্রু-সৈন্যদের ডান দিক থেকে আক্রমণ করলো। বাম দিক থেকে আক্রমণ করলো। সামনে থেকেও আক্রমণ চালালো। হযরত খালিদ নিজেও বীর বিক্রমে লড়তে লাগলেন। লড়তে লড়তে তিনি একাই নয়টি তলোয়ার ভেঙ্গে ফেললেন। রূমী সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিনি তলোয়ার চালাতে লাগলেন। যার গলায় তলোয়ার চালান তারই শির মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বীর খালিদের কাণ্ড দেখে রূমী সৈন্যদলের বড় এক যোদ্ধা ঘোড়ায় চড়ে মুসলমান সৈন্যদের সারির কাছে এগিয়ে এলো। নাম তার যুরযা। হযরত খালিদকে ডেকে সে বললো, খালিদ ! আমি তোমাকে ক'টি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। মিথ্যে না বলে ঠিক ঠিক উত্তর বলে দেবে কিন্তু। জান তো ভদ্রলোক কখনো মিথ্যে কথা বলে না ? আমাকে ধোঁকা দেবে না। কেননা শরীফ লোক কোনদিন কাউকে ধোঁকা দেয় না।

হযরত খালিদ বললেন, 'বলো তুমি কি জানতে চাও ?'

আল্লাহ্‌র তলোয়ার

যুরযা বললো, 'আল্লাহ্ কি তোমাকে কোন তলোয়ার দিয়েছেন'?

হযরত খালিদ বললেন, 'না।'

যুরযা বললো, 'তবে কেন তোমাকে আল্লাহ্‌র তলোয়ার বলা হয়?'

হযরত খালিদ বললেন, আল্লাহ্ আমাদের কাছে নবীজিকে পাঠালেন। নবীজি আমাদের আল্লাহ্‌র কথা বলতে লাগলেন। প্রথমে আমরা সবাই তাঁকে অবিশ্বাস করতাম। তাঁর কথা শুনে হাসতাম। আর তাঁর বিরুদ্ধে লড়তাম। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারলাম। তখন আমরা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করলাম। তাঁর সাথী হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলাম। লড়াই'র মাঠে শত্রুকে খতম করার জন্য আমার রক্ত টগবগিয়ে উঠতো। প্রাণের মায়া ছেড়ে শত্রুর উপর তলোয়ার চালাতাম। লড়াই'র মাঠে শত্রুরা আমাকেই বেশী ভয় পেতো। এ সব দেখে নবীজি একদিন আমাকে বললেন, 'তুমি সাইফুল্লাহ্'। সাইফুল্লাহ্ মানে আল্লাহ্‌র তলোয়ার। এ কারণেই মুসলমানরা আমাকে আল্লাহ্‌র তলোয়ার বলে।

ইসলামের প্রতি যুরযা

যুরযা বললো, বুঝলাম। আচ্ছা, এখন আমাকে কি করতে বলো ?

হযরত খালিদ বললেন, তুমি বলো, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আর হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল।

যুরযা বললো, আজ যদি আমি কলেমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি, তবে কি তোমাদের সমান মুসলমান হতে পারবো ?

হযরত খালিদ বললেন, হাঁ, বরং আমাদের চাইতে তোমার সম্মান আরো বেশী হবে।

যুরযা বললো, বাহ্ঃ ! তা কেমন করে হয় ?

হযরত খালিদ বললেন, আমরা যখন মুসলমান হই তখন নবীজি জীবিত ছিলেন। আমরা তাঁকে দেখেছি। তাঁর পাক যবানে আল্লাহ্র বাণী শুনেছি। মানুষের সংগে তাঁর সুন্দর ব্যবহার দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। সুতরাং আমাদের জন্যে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তোমরা তো নবীজিকে দেখনি, তাঁর পাক যবানে আল্লাহ্র বাণীও শোননি। এখন যদি তোমরা না দেখে নবীজিকে বিশ্বাস কর, তবে আমাদের চাইতে বেশী সম্মান পাবে।

যুরযা তরবারি কোষে বন্ধ করে বললো, আমাকে মুসলমান কর।

হযরত খালিদ তাকে কলেমা পড়িয়ে নিজের তাবুতে নিয়ে গেলেন। ওযু, গোসল করিয়ে দু'রাকাত নামাযও আদায় করালেন। নামায শেষে দু'জন আবার লড়াইর মাঠে এলেন।

শহীদ হলেন যুরযা

যুরযা এখন মুসলমান। মুসলমানদের পক্ষে লড়তে লাগলেন। বহু রুমী সৈন্য তাঁর হাতে খতম হলো। লড়তে লড়তে শেষে তিনি শহীদ হলেন। রক্তে রঞ্জিত যুরযার লাশ দেখে মহাবীর খালিদের রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মুসলিম সৈন্যদের নিয়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে লড়তে লাগলেন।

অপূর্ব ত্যাগ

লড়াই পুরোদমে চল্ছে। এক সময় দেখা গেল মুসলিম বীর সালামার ঘোড়া ময়দানে এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে। সালামা ঘোড়ার পিঠে নেই ! ব্যাপার কি ? তবে কি সালামা দুশমনের হাতে শহীদ হলেন ? সালামাকে খুঁজতে লাগলেন তাঁর চাচাতো ভাই আবূ যাহাম ইবনে হোযায়ফা। ময়দানের এক কোণে যখমী সালামা পড়ে আছেন।

ভাইকে দেখে সালামা 'পানি পানি' বলে চিৎকার করে উঠলেন। ইবনে হোযায়ফা পানির পেয়ালা তুলে ধরলেন ভাই সালামার মুখে। পাশেই আরেক যখ্‌মী সেপাই 'পানি দাও, পানি দাও' বলে কাঁদছে।

সালামা পানি পান না করে মুখের পেয়ালা সরিয়ে পাশের আহত সেপাইকে পানি দিতে ইশারা করলেন। ইবনে হোযায়ফা তাঁর দিকে পানি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। অল্প দূরেই আরো একজন যখ্‌মী সেপাই 'পানি পানি' বলে চিৎকার করছেন। দ্বিতীয় সেপাই পানি পান না করে তৃতীয় সেপাইর দিকে ইশারা করে বললেন, পানি ওকে দাও। তাঁর পিয়াস আমার পিয়াস হতে বেশি। ইবনে হোযায়ফা পানির পেয়ালা নিয়ে তৃতীয় সেপাইয়ের কাছে গেলেন। কিন্তু হায় ! ইতিমধ্যে তৃতীয় সেপাইয়ের মৃত্যু ঘটেছে। পানি নিয়ে ইবনে হোযায়ফা আবার দ্বিতীয় সেপাইর কাছে এলেন। হায় ! তিনিও তখন এ জগতে নেই। তারপর ইবনে হোযায়ফা ভাই সালামার কাছে এসে দেখেন সালামাও নেই। ভেবে দেখ তাঁরা কত মহান ছিলেন ! নিজে পানি পান না করে অপরকে পানি করাতে গিয়ে তিনজন সেপাই-ই শহীদ হলেন পানির পিয়াস নিয়ে। মৃত্যুর সময়ও তাঁরা দেখিয়ে গেলেন মানবতার সেবার পরাকাষ্ঠা।

দু'টুকরা হলো জরজীসের দেহ

দু-পক্ষে তুমুল লড়াই চলতে লাগলো। তলোয়ারের আঘাতে তলোয়ার ভেঙ্গে খান খান হয়ে মাটিতে পড়তে লাগলো।

এগিয়ে এলো খ্রিস্টান বীর জরজীস। মুসলিম সেপাইদের ডেকে বললো, কে আছ মৃত্যুর ভয় না করে আমার সাথে লড়তে চাও ?

হযরত আবূ উবায়দা জবাব দিলেন, 'আমি'। জেনে রেখো, জরজীস ! মুসলমান মৃত্যুকে কখনো ভয় করে না। তোমাদের নিকট মদ যেমন প্রিয়, লড়াইয়ের ময়দানে মৃত্যু আমাদের নিকট তার চাইতেও বেশি প্রিয়।

জরজীস ও হযরত আবূ উবায়দা দু'জনে লড়তে লাগলেন। দু'জনই বীর। বীরে বীরে লড়াই চললো অনেকক্ষণ। হঠাৎ আবূ উবায়দার এক আঘাতে জরজীসের দেহ দু'টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

জরজীসের অবস্থা দেখে সেনাপতি মাহান এগিয়ে এলো। তার সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন মালিক বিন আশ্‌তার।

রূমী সেনাপতি মস্ত বড় বীর। মালিকের সাথে সে অতি কৌশলে লড়াই করতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে টিকে থাকতে পারলো না। মালিক

তলোয়ারের আঘাতে মাহানের এক হাত উড়িয়ে দিলেন। হাত ফেলেই সে ছুটে পালালো নিজ শিবিরের দিকে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলিম সৈন্যদের এরূপ তীব্র আক্রমণে রূমী সৈন্যরা ভয় পেয়ে গেলো। লড়াই ছেড়ে তারা পালাতে লাগলো। তাদের অন্তরে হযরত খালিদের ভয়। কারণ সেদিন হযরত খালিদ একাই এক'শ জন বীরের মতো লড়েছিলেন। তারা যে দিকে চায় সে দিকেই হযরত খালিদের চেহারা দেখে।

রূমী সৈন্যদের কাতারে হযরত খালিদ (রা)

হযরত খালিদ রূমী সৈন্যদের কাতারে ঢুকে তাদের কাতার সাফ করতে লাগলেন। তারা ভয়ে পালাতে চাইলো। কিন্তু পালাবার সুযোগ কোথায়? কারণ লড়াইয়ের জন্যে মাঠ তো ছিলো খুব প্রশস্ত কিন্তু পালাবার জন্যে তা ছিলো অতি সংকীর্ণ। যাদের হাতী-ঘোড়া ছিলো তারা পালিয়ে গেলো। যাদের হাতী-ঘোড়া ছিলো না, মুসলিম সৈন্যরা তাদের পেছনে ধাওয়া করলো। রাতের অন্ধকারে তারা দৌড়াতে দৌড়াতে ইয়ারমূক নদীর বড় এক গর্তে পড়তে লাগলো। প্রাণের ভয়ে যারা গর্তে পড়লো, তারাই খতম হলো।

মুসলিম সৈন্যরা লড়াইর ময়দানে যেখানে যে শত্রুসৈন্য পেলো সেখানেই তাকে খতম করলো। ইয়ারমূকের ময়দানে সেদিন মুসলমানরা এক লাখ শত্রু শেষ করেছিলো।

শেষ দৃশ্য

লড়াইর মাঠে তখন রাতের অন্ধকার বিরাজমান। শত্রুদের এক লাখ লাশ ছাড়া জীবিত কেউ নেই।

হযরত খালিদ চিৎকার দিয়ে ডাকলেন, লড়াইর জন্যে কেউ জীবিত আছ কি? এসো আমরা লড়াইর মজা দেখাই।

মাঠ নীরব। হযরত খালিদের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো একজনও ময়দানে নেই।